সম্মুখীন হতে হয়নি। একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে বিপ্লবের সময়ে ক্রমওয়েলের সাময়িক শাসনকালে লিখিত সাংবিধানিক নিয়মের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তবে তা স্থায়ী হয়নি। **দ্বিতীয়ত,** ব্রিটেনের জনসমষ্টি পুরোপুরি না-হলেও অনেকটাই একই ধরনের—ধর্মীয়, ভাষাগত কিংবা নৃকুলগত ভেদাভেদ তুলনায় কম। ফলে, সংবিধানের মাধ্যমে স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন কখনোই উত্থাপিত হয়নি। **তৃতীয়ত,** ব্রিটেন একটি ছোট্ট দেশ। ছোট্ট দেশ হওয়ার ফলে প্রতিটি অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে ওয়েস্টমিনস্টার-এর সরকারের সংযোগ সহজেই ঘটতে পারে এবং জনসাধারণ সেটা অনুভব করে।

এইসব কারণেই ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত এবং অন্যান্য দেশের লিখিত সংবিধানের থেকে কিছুটা আলাদা। ব্রিটেনে সংবিধান লিখিত না-হওয়ার ফলে আইন ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। এই অভাবপূরণ করতে হয়েছে সংসদের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বা সংসদীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার সাহায্যে।

উপসংহার

২.৩. ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভূমিকা

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল নিরবচ্ছিন্নতা। এই নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কখনোই পরিবর্তিত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ইতিহাসের ধারায় ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন বারবার ঘটেছে। বহু পুরোনো প্রতিষ্ঠান যেমন লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি সমাজবিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে বহু প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হয়েছে কিংবা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু, কোনো পরিবর্তনই আকস্মিকভাবে বা অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে হয়নি। পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে। শাসনব্যবস্থার নীতিগুলির অর্থ পালটালেও সেগুলি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। **উড্রো উইলসনের** (Woodrow Wilson) ভাষায়—"ব্রিটেনের সাংবিধানিক ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অবিরত বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে। যার ফলে, ব্রিটেনের প্রাচীনতম শাসনব্যবস্থা থেকে আধুনিক শাসনব্যবস্থায় বিবর্তনের ধারায় লক্ষ করা যায় এক অসাধারণ নিরবচ্ছিন্নতা।"[৬] সেজন্যই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, স্থায়ী উপাদানের সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপাদানের অপূর্ব সম্মিলন। এটা সম্ভব হয়েছে ব্রিটেনের সংবিধান নমনীয় প্রকৃতির হওয়ায়। প্রয়োজনে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন কিংবা সংশোধনে অসুবিধে হয়নি।

আলোচনার সুবিধের জন্য ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের যুগ—১৪৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ; (২) পরিষদীয় শাসনব্যবস্থার যুগ—এই পর্বের সূচনা ১৪৮৫ সালে এবং অবক্ষয় ও অবসান ১৬০৩ থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে ; (৩) সংসদীয় রাজতন্ত্রের সূচনার এবং সাংবিধানিক-শাসনের যুগ—১৭৮২ সাল পর্যন্ত ; এবং (৪) আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের যুগ—এই পর্বের শুরু ১৭৮২ সাল থেকে।

(১) শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের যুগ

গ্রেট ব্রিটেনের লিখিত ইতিহাসের শুরুতে এই দেশে বসবাস করত কয়েকটি কেল্টিক (Celtic) উপজাতি। এরা খ্রিস্টের জন্মের আগে মধ্য ইউরোপ থেকে ইংলিশ চ্যানেল

(৬) "It has been a leading characteristic of English constitutional history that her political institutions have been incessantly in process of development, a singular continuity marking the whole of the transition from her most ancient to her present forms of government."—W. Wilson, quoted in Munro & Ayearst, P. 29.

কমন্সসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। তবে দৈনন্দিন শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা ছিল প্রিভি কাউন্সিল বা কাউন্সিলের, অর্থাৎ রাজার পরিষদের। রাজা তাঁর পছন্দ অনুসারে পরামর্শদাতাদের এবং কখনো-কখনো গুরুত্বপূর্ণ সামন্তদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠন করতেন। কাউন্সিল ছিল আকারে ছোটো এবং এর গঠন পদ্ধতি ছিল অস্পষ্ট। তবে, আধুনিক মন্ত্রীসভার সঙ্গে এর মিল ছিল, বলা যায় কাউন্সিলই বিবর্তিত হয়ে আধুনিক মন্ত্রীসভার রূপ নিয়েছে। তবে, আধুনিক মন্ত্রীসভাকে যেখানে রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয় কমন্সসভার কাছে, কাউন্সিলকে দায়িত্বশীল থাকতে হত রাজার কাছে। টিউডর যুগের পরে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

(৩) সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সূচনা—১৬৬০

বিপ্লব ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সূচনা

স্টুয়ার্ট রাজাদের যুগে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ এবং পার্লামেন্টের, বিশেষ করে কমন্সসভার, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টিউডর রাজারা তাঁদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্টুয়ার্ট যুগে তার অবসান হয়। ব্রিটেনে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সূচনা হয় এইসময়ই। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিপ্লব, যা **"ইংলিশ রেভেলিউশন"** নামে পরিচিত। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এইসময়ই গড়ে উঠতে থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থার এবং প্রশাসনের নানা ধরনের সংস্কারসাধন এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৪) সংসদীয় গণতন্ত্রের যুগ বা আধুনিক শাসনব্যবস্থার যুগ ঃ

মোটামুটিভাবে বলা যায় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের এই সর্বশেষ পর্যায়ের সূচনা ১৭৮২ সালে। উদারনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র এই সময়ে ব্রিটেনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত ১৮৬৭ সালের পর থেকে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে এই যুগে ব্রিটেনে যে আধুনিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার কয়েকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য—(১) সংসদের ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি এবং সংসদীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ; (২) রাজার ক্ষমতা সংকোচন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ; (৩) ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ; (৪) প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার ; (৫) দলব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা ; (৬) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ ; (৭) আইনের অনুশাসন, ইত্যাদি।

এইভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ব্রিটেনে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থারই আইনগত রূপ ব্রিটেনের সংবিধান।

২.৪. ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়ে থাকে, তার কারণ কোনো গণপরিষদ বা সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থার দ্বারা ব্রিটেনে সংবিধান রচিত হয়নি ; শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। তবে, অলিখিত বলার অর্থ এই নয় যে, ব্রিটিশ সংবিধান সম্পূর্ণতই অলিখিত। ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস লক্ষ করলে অর্থাৎ, ব্রিটেনে সাংবিধানিক আইন ও নিয়মকানুন কোথায় প্রাপ্য, তা লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের সংবিধান পুরোপুরি অলিখিত তো নয়ই, বরং সংবিধানের একটি বিরাট অংশ লিখিত আইনেরই সমষ্টি। নীচে উৎসগুলি সংক্ষেপে বলা হল।

ক্ষমতা বর্ধিত ও কেন্দ্রীভূত হয়। রাজকীয় ক্ষমতার এই শক্তিবৃদ্ধি পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** স্যাক্সন যুগের ইউটান সভা আরও সংগঠিত আকারে **মহাপরিষদের** (Magnum Concilium) রূপ নেয়। প্রথমে ওয়েস্টমিনস্টার, উইঞ্চেস্টার, গ্লাউসেস্টার প্রভৃতি জায়গায় মহাপরিষদের অধিবেশন বসলেও কালক্রমে ওয়েস্টমিনস্টারই হয় স্থায়ী অধিবেশন স্থল। বছরে তিনবার করে মহাপরিষদের অধিবেশন বসত। **তৃতীয়ত,** **'কিউরিয়া রেজিস'** নামে একটি ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হয়, যেটি পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয়ে প্রিভি কাউন্সিল এবং ক্যাবিনেট-এ রূপান্তরিত হয়েছে। মহাপরিষদ ছিল বড়ো সভা, এবং এই সভার অধিবেশন হত বছরে মাত্র তিনবার। সেজন্য প্রয়োজনে রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার ও সাহায্য করার জন্য এবং বিচারকার্য নির্বাহ করার জন্য কার্যকারী সমিতির মতন ক্ষুদ্র পরিষদ গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। প্রথমে ক্ষুদ্র পরিষদ একইসঙ্গে রাজাকে শাসনকার্যে পরামর্শদান ও বিচারকার্যে সাহায্যের কাজ করত। পরে শাসন ও বিচারের কাজের মধ্যে পার্থক্য করে ক্ষুদ্র পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত হয়—একটি অংশ হয় স্থায়ী পরামর্শদানকারী সভা (permanent royal council), পরে প্রিভি কাউন্সিল নামে পরিচিত হয়, অন্যটি শুধু বিচারকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যার থেকে পরবর্তীকালে **মহাধর্মাধিকরণের** (High Court of Justice) উদ্ভব। **চতুর্থত,** নর্ম্যান যুগেই ইংল্যান্ডে বিভিন্ন প্রদেশে (county) ভ্রাম্যমাণ বিচারক পাঠানোর ব্যবস্থা, জুরির সাহায্যে বিচার, শাসন ও বিচারের মধ্যে পার্থক্যকরণ, আইন রচনার ক্ষেত্রে মহাপরিষদের ক্ষমতাবৃদ্ধি, মহাপরিষদের সম্প্রসারণ ইত্যাদি হয়েছিল। এগুলিই পরে আধুনিক ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ হয়েছে।

প্রিভি কাউন্সিলের উদ্ভব

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের এই প্রথম পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল পার্লামেন্টের উদ্ভব। ১২১৩ সালে রাজা জন অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশ (county) থেকে ৪ জন করে নাইটকে একটি অধিবেশনে আহ্বান করেন। একচল্লিশ বছর পরে ১২৫৪ সালে রাজা তৃতীয় হেনরি একই কারণে দু'জন করে প্রতিনিধির সভা আহ্বান করেছিলেন। এই সভাই পরে পার্লামেন্ট নামে পরিচিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে পার্লামেন্টের দুইকক্ষ লর্ডসভা ও কমন্সসভা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ১২১৫ সালে রাজা জন-এর কাছে বিখ্যাত **দাবি সনদ বা ম্যাগনা কার্টা** পেশ। রাজা এই সনদটি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও এই সনদের মাধ্যমে জমিদার বা সামন্তপ্রভুদের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহলেও সনদে ব্যক্ত নীতিগুলিকে ব্রিটেনের ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি বলা যায়।

পার্লামেন্টের উদ্ভব

(২) পরিষদীয় শাসনব্যবস্থার যুগ

ভিত্তি স্থাপনের যুগেই ব্রিটেনে শাসনব্যবস্থার কাঠামোটি রচিত হয়েছিল। রাজতন্ত্র, প্রিভি কাউন্সিল, পার্লামেন্ট, বিচার সংস্থা প্রভৃতি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল। এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৪৮৫ সালে। এর মধ্যেই (১৪৫৫ থেকে ১৪৮৫) সাল পর্যন্ত ৩০ বছর ব্যাপী গোলাপের যুদ্ধের ফলে সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছিল। টিউডর বংশীয় রাজারা এইসময় ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদীয়মান বণিকশ্রেণি এবং নতুন অভিজাতদের সহায়তায় এঁরা রাজার ক্ষমতা সংহত করেন। টিউডর রাজারা পার্লামেন্টের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতেন। যদিও রাজা প্রয়োজনমতো পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতেন এবং অধিবেশন বসতও মাঝে-মধ্যে, তথাপি এইসময় পার্লামেন্টের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে কমন্সসভার ক্ষমতা। কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; সদস্যদের অধিকারেরও সম্প্রসারণ ঘটে। বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে পার্লামেন্ট কার্যনির্বাহ করতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

কমন্স-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি

কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ এর কোনোটিই মৌলিক বলে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি লেখক **আলেক্সি তকভিল** (Tocqueville) এই কারণেই মন্তব্য করেছিলেন, "ব্রিটিশ সংবিধান বলে কিছু নেই।" একই কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা এবং আমেরিকার সংবিধানের অন্যতম তাত্ত্বিক রূপকার **টম পেন** (**Tom Paine**) এডমন্ড বার্ক-এর লেখা ফরাসি বিপ্লব-সংক্রান্ত বইটিতে ব্রিটিশ সংবিধানের গুণকীর্তন লক্ষ করে মন্তব্য করেছিলেন, "মিঃ বার্ক কী এমন প্রত্যক্ষ কিছু দেখাতে পারেন যাকে ব্রিটিশ সংবিধান বলা যায়? যদি না-পারেন, তাহলে আমরা সংগতভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ব্রিটিশ সংবিধান বলে বাস্তবিকই কিছু নেই, এবং কখনোই ছিল না।"

তকভিল বা টম পেন সংকীর্ণ অর্থে সংবিধানকে দেখেছিলেন। এই অর্থেই সংবিধান শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হত একটি নির্দিষ্ট দলিল বোঝাতে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে একটি লিখিত দলিলই বোঝায় না। সংবিধান বলতে বোঝায় সরকারের কাঠামো ও ক্ষমতার নিয়ামক সব ধরনের নিয়মকানুন, প্রথা ও অভ্যাসকে। এই অর্থে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সংবিধান আছে। ব্রিটেনেরও আছে। পার্থক্য এই যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের মতন ব্রিটেনের সংবিধান একটি লিখিত দলিলে অপ্রাপ্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্মেলন থেকেও এ সংবিধান রচিত হয়নি। ব্রিটেনের সংবিধান গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। **মানরো এবং আয়ার্স্টকে** (William Bennett Munro and Morley Ayearst) অনুসরণ করে বলা যায়—"এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নীতি ও আচরিত নিয়মকানুনের জটিল সমাহার; সনদ ও সংসদ-প্রণীত আইন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, সাধারণ আইন (common law), পুরোনো নজির, প্রথা এবং ঐতিহ্য, এসবের একত্রিত যৌগিক রূপ। এটি একটি দলিল নয়; শত শত দলিলের সমষ্টি। এবং কোনো একটিমাত্র উৎস থেকে এটি উদ্ভূত নয়, এর উৎস বহু।"[৩]

ব্যাপক অর্থে আছে

ব্রিটেনের সংবিধানের প্রকৃতির **প্রধান বৈশিষ্ট্যই** হল এর অলিপিবদ্ধ (uncodified), অলিখিত চরিত্র। বস্তুত কোনো সংবিধানই সম্পূর্ণ লিখিত বা সম্পূর্ণ অলিখিত হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের সংবিধানকেও পুরোপুরি লিখিত বলা যায় না। কেন না সংবিধানের লিখিত অংশের পাশাপাশি গড়ে ওঠে অলিখিত অংশ—প্রথা, অভ্যাস ইত্যাদি। অন্যদিকে ব্রিটিশ সংবিধানের সবকিছুই অলিখিত নয়, এমন বহু সাংবিধানিক আইন আছে যা লিখিত। ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত বলা হয় এই কারণে যে, (১) কোনো একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দলিল আকারে এটি লিপিবদ্ধ হয়নি, (২) একটিমাত্র লিখিত সুসংবদ্ধরূপে বই-এর আকারে এই সংবিধান অপ্রাপ্য, (৩) সংবিধানের নিয়মকানুনের একটা বড়ো অংশ প্রথাগত, দীর্ঘকাল ধরে মান্য হয়ে এগুলি গড়ে উঠেছে, এবং (৪) সাংবিধানিক আইন সাধারণ আইনের মতো সংসদ দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে ; আইনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে সাংবিধানিক আইনের স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই।

বৈশিষ্ট্য—অলিখিত চরিত্র

কেন অলিখিত বলা হয়?

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রকৃতির আর-**একটি বৈশিষ্ট্য** হল, এর সজীব চরিত্র। মানরো এবং আয়ার্স্ট বলেছেন, "এটি একটি ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া, কখনোই সম্পূর্ণ নয়"।[৪] আমেরি (L.S. Amiry) মন্তব্য করেছেন,—"এটি একটি সজীব কাঠামো ; পরিবর্তনশীল বাহ্যিক পরিস্থিতির

সজীব চরিত্র

(৩) "It is a complex amalgam of institutions, principles and practices; it is a composite of charters and statutes, of judicial decisions, of common law, of precedents, usages and traditions. It is not one document, but hundreds of them. It is not derived from one source, but from several." Munro & Ayearst, P. 23.

(৪) "It is not a completed thing, but a process of growth".—Munro & Ayearst, P. 23.

উপসংহার ঃ

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান-এর উৎস সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট—(১) ব্রিটেনের সংবিধান পুরোপুরি অলিখিত নয়। সংবিধানের উৎসের মধ্যে যেমন অলিখিত প্রথা এবং রীতিনীতি ইত্যাদি রয়েছে, তেমনি রয়েছে বহু লিখিত আইন, সনদ ইত্যাদি ; (২) ব্রিটেনের সংবিধানের কোনো একটি নির্দিষ্ট উৎসের কথা বলা যায় না, লিখিত ও অলিখিত বিভিন্ন উৎস থেকে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। সংবিধানের লিখিত উৎসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল—বিভিন্ন সনদ, পার্লামেন্ট-প্রণীত নানান আইন, বিচারকদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। অন্যদিকে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অলিখিত উৎসের মধ্যে আছে, সংবিধানের রীতিনীতি, ঐতিহ্য, প্রথা ইত্যাদি। কোনো একটি নির্দিষ্ট দলিলে ব্রিটেনের সংবিধান অপ্রাপ্য। ব্রিটিশ সংবিধানকে জানতে হলে এই বিবিধ উপকরণকে দেখতে হবে।

প্রশ্নাবলি

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
(২) ব্রিটিশ সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।
(৩) ব্রিটিশ সংবিধান কি অলিখিত? এই সংবিধান দলিল হিসেবে অপ্রাপ্য হওয়ার কারণ আলোচনা করো।
(৪) সংক্ষেপে ব্রিটেনের সংবিধানের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ব্রিটেনের সংবিধান কি অলিখিত?
(২) "ব্রিটেনের সংবিধান বলে কিছু নেই"—এই মন্তব্যটি কার?
(৩) ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত হওয়ার দুটি কারণ বলো।
(৪) ব্রিটিশ সংবিধানের আইন নয়, এমন উৎস কী কী?
(৫) ম্যাগনা কার্টা কী?
(৬) অধিকারের সনদ কাকে বলে?
(৭) অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট কী?
(৮) সংবিধানের অলিখিত উৎস কী কী?
(৯) প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সংবিধানের অন্যতম উৎস এমন দুটি বই-এর এবং তার লেখকদের নাম করো।

(৪) ইউরোপিয়ান কমিউনিটি ল ঃ

১৯৭২ সালে রোম চুক্তিতে (Treaty of Rome) ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমবায় (EEC) গঠিত হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী একটি রাষ্ট্র। ফলে রোম চুক্তিতে যেসব বিধিবিধানের ব্যবস্থা আছে তা ব্রিটিশ সরকার মান্য করতে বাধ্য। তা ছাড়া, চুক্তি অনুযায়ী দায়দায়িত্বও পালন করতে হয়। বর্তমানে এটি ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম লিখিত উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। EEC-র কোনো আইন ব্রিটিশ আদালতে বিচার্য হলে কী পদ্ধতিতে আইনটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে, রোম চুক্তি অনুসারে তা স্থির করে দেওয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে ইউরোপীয় আদালতের (European Court of Justice)-ওপর।

খ. আইন নয় এমন নিয়ম-কানুন বা সংবিধানের অলিখিত উৎস ঃ

সাংবিধানিক রাজনীতি

গ্রেট ব্রিটেনে সার্বভৌম (রাজা বা রানি), প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, পার্লামেন্ট (বা সংসদের) সদস্য, বিচারক, রষ্ট্রকৃত্যক (আমলা) প্রভৃতি পদের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব-সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ আইনের কিংবা বিচারপতি-সৃষ্ট আইনের রূপে অপ্রাপ্য। এইসব নিয়মকানুন নিয়ে কোনো বিতর্ক উপস্থিত হলে বা এগুলি ভঙ্গ হলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায় না বা আদালত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে না। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে এইসব অলিখিত সাংবিধানিক নিয়মকানুনকে অভিহিত করেছেন। যেমন অস্টিনের মতে, এগুলি সংবিধানের "**ইতিবাচক নীতিসমূহ**" ("Positive morality of the constitution"); মিলের মতে, "**সংবিধানের অলিখিত নীতি বা নিয়ম**" ("unwritten maxims of the constitution"); ফ্রিম্যানের ভাষায়, "রাজনৈতিক নীতিব্যবস্থা, রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য অনুসরণীয় বিধিবিধানের সংহিতা" ("whole system of political morality, a whole code of precepts for the guidance of public men")। ডাইসি এগুলিকেই **সাংবিধানিক রীতিনীতি** (constitutional conventions) আখ্যা দিয়েছেন। বর্তমানে এই অলিখিত নিয়মাবলি ওই নামেই পরিচিত। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের মূল অলিখিত উৎস।

(সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরের অধ্যায়ে আছে।)

গ. অন্যান্য উৎস ঃ

ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যান্য উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি—(১) সংসদীয় প্রথা বা রীতিনীতি ও সংসদ-সম্পর্কিত আইন, এবং (২) সংবিধান ও আইন-সংক্রান্ত লেখাপত্র।

(১) সংসদীয় প্রথা বা রীতিনীতি এবং সংসদ-সম্পর্কিত আইন বলতে বোঝায় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী-সংক্রান্ত আইন ও নিয়মকানুন। কমন্সসভার নির্দেশাবলি (standing orders), সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাব, সভার কার্যপরিচালনা-সংক্রান্ত নিয়ম এবং স্পিকারের বিভিন্ন নির্দেশের (ruling) মধ্যে এগুলি প্রাপ্য।

সংসদের নিয়মকানুন

(২) সংবিধান ও আইন-সংক্রান্ত প্রামাণ্য কিছু বইকেও গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের একটি উৎস বলে মনে করা হয়। কোনো একটি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা অথবা একটি সাধারণ আইনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময়ই এইসব প্রামাণ্য লেখার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ওয়াল্টার বেজট-এর "**দ্য ইংলিশ কনস্টিটিউশন**", এস্‌কিন মে-র "**পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস**", এ. ভি. ডাইসি-র "**অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য ল অব দ্য কনস্টিটিউশন**", ব্ল্যাকস্টোন-এর "**কমেনটারিস অন দ্য ল'জ অব ইংল্যান্ড**", স্যার আইভর জেনিংস-এর "**ক্যাবিনেট গভর্নমেন্ট**", এবং "**পার্লামেন্ট**", জন ম্যাকিনটোশ-এর "**দ্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট**"—এই ধরনের প্রামাণ্য বই-এর উদাহরণ।

সংবিধান সম্পর্কে প্রামাণ্য বই

২ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস ও প্রকৃতি

২.১. ব্রিটিশ সংবিধানের প্রকৃতি। ২.৩. ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস।
২.২. ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত হওয়ার কারণ। ২.৪. ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস।

২.১. ব্রিটিশ সংবিধানের প্রকৃতি

আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের ব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত সংবিধানের ধারণাটির দুটি অর্থ। একটি সংকীর্ণ অর্থ। এটিই প্রচলিত অর্থ। এই অর্থে সংবিধান বলতে বোঝায় একটি লিখিত এবং বিশেষ আইনগত মর্যাদাসম্পন্ন দলিল (document)—কতকগুলি মৌলিক আইনের সমষ্টি। সরকারের দেহযন্ত্র, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও মুখ্য কার্যাবলি, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক ইত্যাদি পরিচালিত হয় সংবিধানের আইনের দ্বারা। দ্বিতীয় অর্থটি ব্যাপক। এই অর্থে সংবিধান বলতে বোঝায় একটি দেশের শাসনব্যবস্থার সমগ্র রূপটি। সংবিধান মানে, সেইসব নিয়মকানুন, আইন, প্রথা এবং রীতিনীতি—যার দ্বারা শাসনব্যবস্থা গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বললে, সরকার ও রাজনীতির পরিচালনার স্বীকৃত ও মান্য নিয়মরীতি।[১] এই ব্যাপক অর্থে সংবিধানের সংজ্ঞার্থ করে ডেনিস ক্যাভানা বলেছেন, সংবিধান হল কতকগুলি মূলনীতি এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি যেগুলির সাহায্যে রাষ্ট্র বা অন্যান্য সংগঠন পরিচালিত হয়। সাধারণত সংবিধান শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও গঠন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করে।[২]

সংবিধানের সংজ্ঞার্থ

সংবিধানের প্রথম সংজ্ঞার্থটি গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই অর্থে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ার্ল্যান্ড যুক্তরাজ্যের কোনো সংবিধান নেই। কেন না, এমন কোনো একটি লিখিত দলিল বা সুনির্দিষ্ট আইনের সমষ্টি নেই, যেটি গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন, রাজা বা রানি, মন্ত্রীসভা, সংসদ, বিচারালয় ইত্যাদির) ক্ষমতার উৎস ; অথবা যে আইন অনুসারে এইসব প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গঠন ও ক্ষমতা এবং তাদের সম্পর্ক-সংক্রান্ত সংসদ-প্রণীত আইন, সাধারণ আইন (Common law) বা দীর্ঘকাল ধরে মান্য করা হয় এমন রীতিনীতি (Convention) ব্রিটেনে আছে ; কিন্তু এইসব আইন, প্রথা বা বিচারালয়ের রায়ের কোন্‌টি সাংবিধানিক আইন হিসেবে মান্য, কোন্‌টি নয়, তা সুনির্দিষ্ট করে কোথাও বলে দেওয়া নেই। তা ছাড়া, রীতিনীতি কিংবা প্রথা ভঙ্গ হলে তার প্রতিবিধানের

সংকীর্ণ অর্থে ব্রিটেনে সংবিধান নেই

(১) সংবিধানের তৃতীয় একটি সংজ্ঞার্থও আছে। এই অর্থে সংবিধান বলতে বোঝায়, একটি শাসনব্যবস্থার চরিত্র অথবা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গঠন ও ক্ষমতা প্রয়োগের শর্তাবলি—দ্রঃ Dennis Kavanagh : British Politics, P. 45 (notes)।

(২) ক্যাভানা যে সংজ্ঞার্থ করেছেন, তাতে—সংবিধান হল, "A body of fundamental principle and rules according to which a state, or other organisation is governed. A constitution usually specifies the composition and powers of governing institutions, the relationship between them, and the relationship between the state and the citizen". (Kavanagh 4 edn., 2000)

এই শর্তগুলি **অধিকার-সংক্রান্ত সনদ** (Bill of Rights) হিসেবে পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। এই সনদে স্বাধীন নির্বাচন, পার্লামেন্টের সদস্যদের বাক্‌স্বাধীনতা, ঘন ঘন পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান, জুরির সাহায্যে বিচার, বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিপ্রদান নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি সুনিশ্চিত হয়েছিল। ১৬৮৯ সালে স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট অনুরূপ একটি আইন পাস করে যেটি **Claim of Right** নামে পরিচিত। ব্রিটেনে আধুনিক সংবিধানের ভিত্তি রচনায় এই দুইটি অধিকারের সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট ঃ এই আইনটি পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ১৭৮০ সালে। এই আইনে সিংহাসনে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। শুধু তাই নয়। এই আইনে অধিকারের সনদের পরিপূরক আরও কয়েকটি অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা পার্লামেন্ট কর্তৃক ধার্য করার অধিকার, পার্লামেন্টের বিচারপতিকে অপসারণ করার অধিকার, কমন্সসভায় বিশেষভাবে অভিযুক্ত করার (impeach) অধিকার ইত্যাদির স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য। বিল অব রাইটস এবং অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট একত্রে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে খর্ব করে পার্লামেন্টের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট

(৩) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বা বিচারপতি-প্রণীত আইন ঃ

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উৎস হল, বিভিন্ন সময়ে ঊর্ধ্বতন আদালতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যেগুলি আইনসংক্রান্ত প্রতিবেদনে (Law reports) নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এগুলিকে বিচারালয়-প্রণীত আইন বলা যায়। এই আইন প্রধানত দু-ধরনের—সাধারণ আইন (Common law) এবং পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচারপতি-সৃষ্ট আইন।

সাধারণ আইন ঃ বিচারকেরা বিভিন্ন মামলার বিচার করতে গিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আচরিত যেসব প্রথা ও রীতিনীতিকে আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেগুলিকে **সাধারণ আইন** বা **কমন ল** বলা হয়। ব্রিটেনে রাজার বিশেষাধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা-সংক্রান্ত সব আইনই সাধারণ আইন। যেমন, নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের চুক্তি করার অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার-সংক্রান্ত সব আইন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনো কর্মচারী বেআইনি কাজ করলে প্রতিবিধানের আইন, হেবিয়াস কর্পাস ইত্যাদি, সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্ত। পার্লামেন্ট ইচ্ছে করলে এই ধরনের আইনকে সংশোধিত করতে, বাতিল করতে কিংবা বিধিবদ্ধ আইনের রূপ দিয়ে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে।

কমন ল

পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের (Statute law) ব্যাখ্যা ঃ গ্রেট ব্রিটেনে সংসদ বা পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে পার্লামেন্ট-প্রণীত কোনো আইনকে বাতিল করার বা অ-সাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষমতা বিচারালয়ের নেই। কিন্তু আদালত পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনকে ব্যাখ্যা করতে পারে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচারালয় কার্যত নতুন আইন রচনা করে, যেগুলিকে **বিচারপতি-সৃষ্ট আইন** বলে অভিহিত করা যায়। এই ধরনের আইন ব্রিটেনের সংবিধানের লিখিত উৎসের অন্যতম। উদাহরণস্বরূপ ঃ রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ না-দিয়ে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে না, ব্রিটেনের এই আইনগত নির্দেশটি ১৯১৯ সালে বিচারালয়ের একটি রায় থেকে উদ্ভূত। অনুরূপভাবে, কোনো নাগরিককেই বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না—এই নির্দেশটিও ১৯২০ সালের একটি মামলার রায়ের ফল।

বিচারালয়ের রায় বা বিচারপতি-সৃষ্ট আইন

অতিক্রম করে এসে ব্রিটেনে বসবাস শুরু করে। এদের সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ৫৪ খ্রিস্টাব্দে জুলিয়াস সিজার ব্রিটেন আক্রমণ করেন, কিন্তু স্থায়ী শাসন প্রবর্তন করেননি। এর এক শতাব্দী পরে ব্রিটেনে প্রথম রোমানদের শাসন প্রবর্তিত হয় সম্রাট ক্লডিয়াস-এর সময়। ৪০০ বছরের রোমান শাসনে ব্রিটেনে রোমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখা গেলেও রোমান শাসনের অবসানের পর অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর ডেন, এঙ্গল ও সবশেষে স্যাক্সন উপজাতীয়রা ইংল্যান্ড দখল করে। ব্রিটেনের অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব এই সময়। যেমন, স্যাক্সনরা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। নবম ও দশম শতাব্দীতেই **'উইটান' বা উইটিনাজিমোট** (Witenagemot) নামে বিজ্ঞজনের সভারও উদ্ভব হয়। এই সভা পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও অনেক ব্যাপারে রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করত। 'উইটান' সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, গির্জার উচ্চপদস্থ পাদরি (বিশপ ও অ্যাবট) এবং জমিদার ও অন্যান্য অভিজাত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সভা গঠিত হত। স্থায়ী সদস্যপদ ছিল না। সদস্যরা নির্বাচিতও হতেন না। রাজা তাঁর পছন্দমতো ব্যক্তিকে উইটান সভায় ডাকতেন। তখন রাজধানী বলে কিছু ছিল না। সেজন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে উইটান-এর অধিবেশন বসত। রাজা সভাপতিত্ব করতেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়াই ছিল উইটান সভার প্রধান কাজ। তা ছাড়া, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা ও প্রয়োজনে রাজাকে নিয়ন্ত্রণের কাজও উইটান করত। এটিকেই বলা যায় ব্রিটেনের সংসদের আদি রূপ।

উইটান-সভা

শুধু বিজ্ঞজনের সভাই (Witan) নয়, স্যাক্সন যুগে ইংল্যান্ডে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও প্রথম প্রবর্তিত হয়। ছোটো ছোটো গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত হত এক-একটি **শহর** (township), বেশ কয়েকটি শহর নিয়ে এক-একটি **হানড্রেড** এবং একাধিক হানড্রেড নিয়ে এক-একটি **শায়ার** (Shire)[৭]। প্রতিটি শায়ারে থাকত আদালত, একজন উচ্চপদস্থ শাসনকর্তা (Sheriff)[৮] এবং শায়ারের অ্যাসেম্বলি বা প্রতিনিধিসভা। পরবর্তীকালে এইসব শায়ারই কাউন্টি বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের আধুনিক রূপ নিয়েছে। স্যাক্সন যুগে ইংল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। **প্রথমত,** সমগ্র রাজ্যে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। **দ্বিতীয়ত,** এটিই ছিল বর্তমানের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার আদি রূপ। এবং **তৃতীয়ত,** এই ব্যবস্থা, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। স্যাক্সন যুগের পর ব্রিটেনে নর্ম্যানদের শাসন প্রবর্তিত হলে এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বিকাশলাভ করে।

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডির রাজা উইলিয়াম দ্য কন্‌কোয়ারার (William the Conqueror) ইংল্যান্ড জয় করেন একাদশ শতাব্দীতে। চারশো বছরের নর্ম্যান শাসনকালে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত,** রাজার

---

(৭) বেশিরভাগ শায়ারই ছিল পূর্বতন ছোটো ছোটো রাজ্য। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এগুলিকে শায়ার বলা হত। এগুলিই বর্তমানে **কাউন্টি** (county) নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি শায়ারে প্রধানত বিচারকার্য পরিচালনার জন্য একটি করে সংসদ বা জাতীয় সভা থাকত। এগুলিকে বলা হত শায়ার-মুট (Shire-moot)। একজন করে অল্ডারম্যান (earldorman) থাকতেন সভাপতি। পরে এঁরাই আর্ল (earl) নামে পরিচিত হন, যার থেকে আর্লডম (earldom) কথাটা এসেছে।
দ্রঃ F.W. Martland : The Constitutional History of England, P. 39-40.

(৮) Shire reeve থেকে Sheriff নামটি এসেছে।